ترک معشوقی کن و کن عاشقی ** ای گمان برده که خوب و فایقی

ای که در معنی ز شب خامش تری ** گفت خود را چند جویی مشتری

তাসাউফের মর্মকথা

মাওলানা মো. গিয়াস উদ্দিন (ফুলতলী)

তাসাউফের মর্মকথা

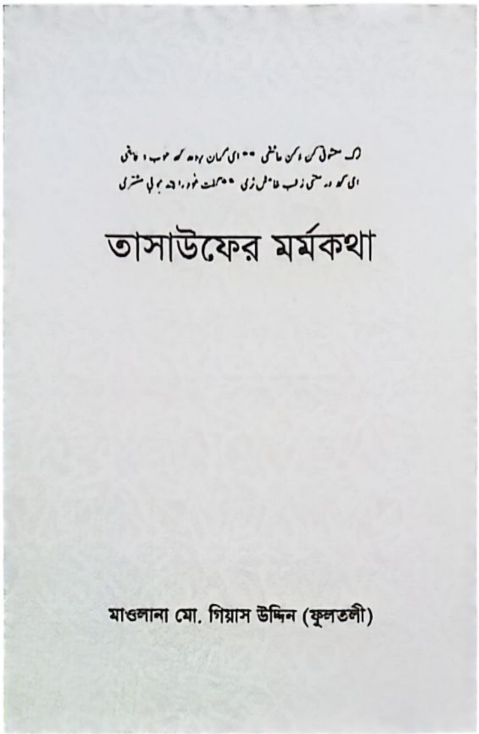

প্রকাশকাল: নভেম্বর-২০২৪

মূল্য: ৩০ টাকা

মাওলানা মো. গিয়াস উদ্দিন (ফুলতলী)

ভূমিকা

আমাদের সমাজে কিছু পরহেযগার মানুষের অবস্থা এমন যে, তারা প্রকাশ্যে সকল সৎ কাজ করে থাকেন। নফল নামায, নফল রোযা, নিয়মিত তাসবীহ ইত্যাদি করে থাকেন। সাধারণ পোশাক পরিধান করেন এবং অল্প আহার করেন। কিন্তু তারা নিজেকে হিংসা, কু-প্রবৃত্তি, রিয়া ইত্যাদি থেকে মুক্ত রাখতে পারেন না। তারা পছন্দ করেন মানুষ তাদের নিকট আসুক এবং তাদের ভক্তি-শ্রদ্ধা করুক। এজন্য তারা বাহ্যিকভাবে ইবাদতগুযার হলেও তারা তাদের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করতে পারেন না। অর্থাৎ তাদের পক্ষে তাসাউফের মূল লক্ষ্যে পৌঁছা সম্ভব হয় না।

ইমাম গাজ্জালী (র.) বলেন- (১) কিছু সংখ্যক পরহেযগার আবিদের অবস্থা এই যে, তারা সাধারণ পোশাক পরিধান করে, অল্প আহার করে এবং ধনাসক্তি পরিহার করে। কিন্তু লোকের ভক্তি ও সম্মান পাওয়ার লোভ তারা সংবরণ করতে পারে না। লোকজন বরকত লাভের আশায় তাদের কাছে আগমন করলে তারা সন্তুষ্ট হয় এবং লোক-সম্মুখে নিজেদের বেশ সাজিয়ে রাখেন। তারা জানে না যে, ধনাসক্তি অপেক্ষা সম্মান-মর্যাদার লিপ্সা দমন করা কষ্টসাধ্য। কারণ সম্মান-লালসায় মুগ্ধ হয়ে মানুষ অম্লান বদনে সকল কষ্ট সহ্য করে। যে ব্যক্তি সম্মান, লিপ্সা ও প্রভুত্ব-প্রিয়তা পরিত্যাগ করতে পেরেছেন, তিনিই যথার্থ মুত্তাকি বা পরহেযগার। (কিমিয়ায়ে সাআদাত)

(২) এক শ্রেণির আবিদ প্রকাশ্যভাবে সকল সৎকার্য করে থাকে। যেমন- প্রত্যহ হাজার রাকাত নফল নামায পড়ে, হাজার তাসবীহ পাঠ করে, সমস্ত রাত্রি জেগে ইবাদত করে এবং প্রত্যহ রোযা রাখে। কিন্তু কু-প্রবৃত্তি থেকে হৃদয় পবিত্র করতে যত্নবান হয় না। অতএব তাদের হৃদয় ঈর্ষা, রিয়া, অহংকার ইত্যাদি কু-প্রবৃত্তিতে পরিপূর্ণ থাকে। (কিমিয়ায়ে সাআদাত)

আমি উক্ত বইয়ে কিছু হাদীস এবং বুযুর্গানে কিরামের বাণী তুলে ধরেছি, যাতে মানুষ আমলের প্রকৃত উদ্দেশ্য সঠিকভাবে বুঝতে পারে এবং তাসাউফের মমার্থ অনুধাবন করতে পারে।

আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে দিলের অবস্থার পরিবর্তনের জন্য বুযুর্গানে কিরামের কথাগুলো থেকে শিক্ষা গ্রহণ করি এবং আমি চাই তরিকতের ভাইগণও যাতে বুযুর্গানে কিরামের কথা থেকে ইবরত হাসিল করেন।

তাসাউফের মর্মকথা

عن أبيٍ هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ثلاث منجيات، وثلاث مهلكات. فأماالمنجيات: فتقوى الله في السر والعلانية، والقول بالحق في الرضا والسخط، والقصد في الغنى والفقر. وأما المهلكات: فهوى متبع، وشح مطاع، وإعجاب المرء بنفسه، وهي أشدهن-

অনুবাদঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন- তিনটি জিনিস পরিত্রাণকারী এবং তিনটি জিনিস ধ্বংসকারী। পরিত্রাণকারী জিনিসগুলো হচ্ছে- ১. প্রকাশ্যে ও গোপনে আল্লাহকে ভয় করা, ২. সন্তুষ্ট ও অসন্তুষ্ট উভয় অবস্থায় উচিত কথা বলা, ৩. ধনী ও দরিদ্র উভয় অবস্থায় মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা। ধ্বংসকারী জিনিসগুলো এই- ১. প্রবৃত্তির অনুসারী হওয়া ২. লোভ-লালসা করা, ৩. কোনো ব্যক্তি নিজেকে নিজে সম্মানিত মনে করা। আর এ স্বভাবটিই সবচেয়ে খারাপ স্বভাব। (বায়হাকী শরীফ)

'আশিক' হচ্ছেন ঐ ব্যক্তি যে কারো প্রতি আন্তরিক মহব্বত রাখেন, আর মা'শুক হচ্ছেন ঐ ব্যক্তি যার প্রতি ভালোবাসার সম্পর্ক রাখা হয়। দেখা যায়, সাধারণতঃ কিছু মানুষ চায় মা'শুক হতে, অর্থাৎ তাকে মানুষ ভালোবাসুক, তার প্রতি আন্তরিক মহব্বত রাখুক, তাকে অনুসরণীয় মনে করুক। কিন্তু এটা চিন্তা করে না যে, তার মধ্যে কি এমন বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যার ফলে মানুষ তার প্রতি আসক্ত হবে। নিজেকে অন্যের চেয়ে গুণী ও উত্তম মনে করার এমন ধারণা থেকেই তার অন্তরে অহংকার সৃষ্টি হয়। অথচ যুগে যুগে আল্লাহওয়ালাদের ধ্যান ধারণা ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। তারা নিজেকে মা'শুক কল্পনা করার চেয়ে আশিক মনে করাকে প্রাধান্য দিতেন। মানুষকেও একাজে নির্দেশ দিতেন।

এ প্রসঙ্গে আল্লামা রূমী (র.) মসনবী শরীফে লিখেন-

ترک معشوقی کن وکن عاشقی ** ای گمان بردہ کہ خوب و فایقی

ای کہ در معنی زشب خامش تری **گفت خود را چند جوئی مشتری

-মা'শুকিয়ত ছেড়ে দাও, আশিকী গ্রহণ কর। কারণ মা'শুক হতে হলে পরিমাপ করতে হবে যে, তোমার ঘাড় কত লম্বা, বক্ষ কত প্রশস্ত, নাক কত দীর্ঘ, চোখ কেমন। কিন্তু আশিক হলে কোনো কিছুর পরিমাপের প্রয়োজন

নেই। কারণ আশিকদের কোনো হিসাব করতে হয় না। একজন কালো ও অসুন্দর ব্যক্তিও আশিক হতে পারবে। মাওলানা রুমী (র.) বলেন, তুমি মা'শুক হয়ো না, নিজের সৌন্দর্য ও পূর্ণতার দিকে দৃষ্টি দিবে না, নিজেকে এরূপ মনে করবে না যে, আমিই বড় মুত্তাকী, ইবাদতকারী ও পরহেজগার। কেননা তোমার সকল সৌন্দর্যে ত্রুটি বের হয়ে আসতে পারে। আর নিজেকে মা'শুক মনে করলে তুমি আল্লাহর মহানত্বকে গৌরবের যোগ্য, ইবাদতের যোগ্য মনে করতে পারবে না। তাই আশিক হয়ে যাও। আপাদমস্তক ত্রুটিযুক্ত হয়েও বান্দাহ আল্লাহর আশিক হতে পারে। আশিক ব্যক্তি বলে থাকেন, হে আল্লাহ আমার ভেতর কোনো সৌন্দর্য নেই, কিন্তু আমি তোমাকে মহব্বত করি। আল্লাহ তায়ালাকে বিনয়ের সাথে পছন্দ করি। (মসনবী শরীফ)

তবে আশিক হওয়ার অর্থ এই নয় যে, তিনি মা'শুক হতে পারবেন না। বরং আল্লাহ তাকে মা'শুক বানিয়ে দিবেন।

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে-

عن أنسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في حديث طويل وما أَقْبَلَ عَبْدٌ بِقَلْبِهِ إِلَّا جَعَلَ قُلُوبَ الْمُؤْمِنِينَ تَقَادُ إِلَيْهِ بِالْوُدِّ وَالرَّحْمَةِ، وَكَانَ الله تعالى إِلَيْهِ بِكُلِّ خَيْرٍ أَسْرَعَ– (الطبرني)

-হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.)এক দীর্ঘ হাদীসে বর্ণনা করেন, যখন কোনো ব্যক্তি তার অন্তরকে আল্লাহ তায়ালার দিকে ধাবিত করে দেয়, তখন আল্লাহ তাআলা ভালোবাসা ও অনুগ্রহ সহকারে মুমিন বান্দাহদের অন্তর তার দিকে ধাবিত করে দেন। আর সকল কল্যাণকর বিষয় আল্লাহতাআলা তার নিকট দ্রুত পৌঁছিয়ে দেন। (তাবরানী)

ইমাম নববী (র.) রিয়াদুস সালিহীন কিতাবে ইমাম মুসলিম (র.) হতে একটি বর্ণনা নকল করেছেন। এই বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যে, যখন হযরত উমর (রা.) মানুষের কাছে হযরত ওয়েস কারণী (র.) এর পরিচয় তুলে ধরলেন, তখন মানুষ তাকে চিনে ফেলেছিল। এর পরই তিনি একেবারে লোকচক্ষুর অন্তরাল হয়ে গেলেন। এর পূর্বেও তিনি মানুষের চোখের আড়ালে থাকতে পছন্দ করতেন। কিন্তু লোক চক্ষুর অন্তরালে থাকলেও হযরত ওয়েস কারণী (র.) আজ পর্যন্ত মানুষের অন্তরে স্থান করে নিয়েছেন মা'শুক হিসাবে। হযরত

উমর (রা.) রাসূল (সা.) এর জবান থেকে তার কথা শুনে আশিক হয়ে ওয়েস করণী (র.) এর সাথে দেখা করেন এবং তাকে দিয়ে দু'আ করান।

পক্ষান্তরে যারা মা'শুক হওয়ার মন-মানসিকতা রাখেন তাদের বদ-অভ্যাস হচ্ছে, তারা নিজের প্রশংসা নিজেরা করে থাকেন এবং তারা চান তাদের প্রশংসা অন্যজন করুক।

এ প্রসঙ্গে ফরিদ উদ্দিন আত্তার (র.) তার একটি কবিতায় লিখেছেন-

নিজে নিজের প্রশংসা করা শয়তানের কাজ। যে নিজেকে ছোট মনে করে সেই প্রকৃত মানুষ। শয়তান বলেছিল আমি আদমের চেয়ে উত্তম। এ কারণে সে কিয়ামত পর্যন্ত অভিশপ্ত হয়েছে। বিনয় থেকেই মাটি আদম হওয়ার মর্যাদা লাভ করে। আগুনের আলো অহংকারে ম্লান হয়ে যায়। শয়তান অহংকার করে অভিশপ্ত হয়েছে আর আদম ক্ষমা প্রার্থনা করে সৌভাগ্যবান হয়েছেন।

ইমাম গাযালী (র.) তার 'কিমিয়ায়ে সাআদাত' গ্রন্থে লিখেন-

কতক পরহেযগার আবিদের অবস্থা এই যে, তারা সাধারণ পোশাক পরিধান করে; অল্প আহার করে এবং ধনাসক্তি পরিহার করে। কিন্তু লোকের ভক্তি ও সম্মান পাওয়ার লোভ তারা সংবরণ করতে পারে না। লোকজন বরকত লাভের আশায় তাদের কাছে আগমন করলে তারা সন্তুষ্ট হন এবং লোক-সম্মুখে নিজেদের বেশ সাজিয়ে রাখেন। তারা জানে না যে, ধনাসক্তি অপেক্ষা সম্মান-মর্যাদার লিপ্সা দমন করা কষ্টসাধ্য। কারণ, সম্মান-লালসায় মুগ্ধ হয়ে মানুষ অম্লান বদনে সকল কষ্ট সহ্য করে। যে ব্যক্তি সম্মান, লিপ্সা ও প্রভুত্ব প্রিয়তা পরিত্যাগ করতে পেরেছেন, তিনিই যথার্থ মুত্তাকি বা পরহেযগার। (কিমিয়ায়ে সাআদাত)

-এক শ্রেণির আবিদ প্রকাশ্যভাবে সকল সৎকার্য করে থাকে; যেমন- প্রত্যহ হাজার রাকাআত নফল নামায পড়ে; হাজার তাসবীহ পাঠ করে; সমস্ত রাত্রি জেগে ইবাদত করে এবং প্রত্যহ রোযা রাখে। কিন্তু কুপ্রবৃত্তি থেকে হৃদয় পবিত্র করতে যত্নবান হয় না। অতএব তাদের হৃদয় ঈর্ষা, রিয়া, অহংকার ইত্যাদি কুপ্রবৃত্তিতে পরিপূর্ণ থাকে। (কিমিয়ায়ে সাআদাত)

কামিল না হয়েও নিজেকে কামিল হিসেবে প্রকাশ করার অপচেষ্টাকারীদের উদ্দ্যেশ্যে রাসূলে কারীম (সা.) ইরশাদ করেন, হযরত আসমা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন,

الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يَنَلْ كَلابِس ثوبي زور–

- যে ব্যক্তি যা তাকে প্রদান করা হয়নি তা লাভ করার ভান করল সে ব্যক্তি যেন দুটি মিথ্যার পোশাক পরিধান করল। অর্থাৎ লুঙ্গি এবং চাদর উভয়টি, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে আগাগোড়াই সে মিথ্যাবাদী বা কপট। (তিরমিযী ব্যতীত সিহাহ সিত্তাহর সকলেই হাদীসখানা বর্ণনা করেছেন)

ইমাম আবুল কাসিম কুশাইরী (র.) বলেন, আলী ইবন আবদুল হুমাইদ বলেন,

سمعت سري يقول من تزين بما ليس فيه سقط من عين الله– (الرسالة القشيرية)

আমি সিররীর নিকট শুনেছি তিনি বলেন, যে ব্যক্তি বাস্তবে যেমন নয় এমনভাবে নিজেকে সুসজ্জিত করে উপস্থাপন করল, সে ব্যক্তি আল্লাহর দৃষ্টি থেকে যেন (ছিটকে) পড়ে গেল। (আর রিসালাতুল কুশাইরিয়্যা)

ঐ সমস্ত অপরিপক্ক লোকদের উদ্দ্যেশ্যে আল্লামা ইকবাল বলেন-

-পুনরায় সত্যবাদিতা, ন্যায়পরায়ণতা, সাহসিকতার সবক গ্রহণ করো। তাহলে দুনিয়ার নেতৃত্বের কাজ তোমাকে দেওয়া হবে।

বর্ণিত হাদীসে مالم يعط 'যা লাভ করেনি বা যা তাকে প্রদান করা হয়নি' বাক্যটি রূপকার্থবোধক এবং এর দ্বারা আধ্যাত্মিক বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত। কাজেই যে ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে কামিল নন অথচ কথায়, কাজে ও আচরণে কামিল বা বুযুর্গ হওয়ার ভান করে তাকেও নিন্দা করা হয়েছে।

যারা নিজেদেরকে বুযুর্গ মনে করেন কিন্তু বাস্তবে তাদের মধ্যে এর কিছুই নেই, তাদের উদ্দেশ্যে মাওলানা জালালুদ্দীন রূমী (র.) কিছু কবিতার লাইন লিখেন যার বাংলা অনুবাদ নিম্নরূপ-

১। আমাদের বাহ্যিক অবস্থা ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যার ভাষা চাকচিক্যময় অথচ অন্তর কলুষিত।

২। তার মধ্যে আল্লাহর তরফ থেকে মারিফাতের নাম গন্ধও নেই। অথচ হযরত শীস ও আদম (আ.) এর চেয়ে অধিক পরিমাণে দ্বীনী দাওয়াত ও তাবলীগ করে থাকে।

৩। (কাশফ) কারামতের অবস্থা এই যে শয়তানও কখনো নিজেকে স্বীয় আকৃতি দেখায় না, অথচ তার দাবি এই যে, আমি আবদাল, কুতুব (অলিদের উঁচুস্তর) হতেও অগ্রগামী।

৪। বুযুর্গানে দ্বীনের অনেক বাণী চুরি করে নিজের করে নিয়েছে, যাতে সাধারণ মানুষ মনে করে সে অনেক বড় বুযুর্গ।

৫। স্বীয় খ্যাতি বর্ধিত করার মানসে বায়েজীদ বোস্তামীর মতো ওলীদেরও ভুল-ত্রুটি খুঁজে বেড়ায়। তার অন্তর দর্শনে ইয়াযীদের মতো অন্তরও লজ্জিত হয়ে যায়।

সূফী-সাধক আল্লামা জালালুদ্দীন রূমী (র.) আরো বলেন–

অনুবাদঃ (মায়া কান্না উপকারী নয় বরং) প্রার্থিত বস্তু অন্তরের কান্নার উপর নির্ভরশীল। কাকুতি মিনতী সহকারে দু'আ ব্যতীত সফলতা লাভ করা অতি দুরূহ। (মসনবী শরীফ)

সত্যিকারার্থে যারা বুযুর্গ তারা মাঝে মাঝে শুকরিয়া হিসাবে নিয়ামতের আলোচনা করেন। কারণ আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ হচ্ছে নিয়ামতের কথা বর্ণনা করা। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- **وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ**

অভ্যন্তরীণ পরিশুদ্ধতার বিষয়ে الرسالة القشيرية গ্রন্থে ইমাম আবুল কাশিম কুশাইরী (র.) বলেন–

অনুবাদঃ উস্তায আবু আলী দাক্কাক থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, অন্তরের পরিশুদ্ধি (বা ইখলাস) হলো লোকজনের দৃষ্টি থেকে বেঁচে থাকা। আর সত্য হলো এমন বিষয় যে, তোমার নফস তোমার আমল দেখতে পায় না। কাজেই মুখলিস বা অভ্যন্তরীণ পরিশুদ্ধি অবলম্বনকারীর 'রিয়া' বা লোক দেখানো কোনো বিষয় থাকে না। আর সত্যবাদীর মধ্যে কোনো ধরনের অহংকার থাকে না। (আর-রিসালাতুল কুশাইরিয়া)

যুন্নুন মিসরী রহ. বলেন–

অনুবাদঃ ইখলাস বা অভ্যন্তরীণ পরিশুদ্ধির চিহ্ন তিনটি। (১) জনসাধারণের নিন্দা ও প্রশংসা সমান মনে করা (২) আমলের মধ্যে নিজের আমলকে গণ্য করা ভুলে যাওয়া ও (৩) পরকালে নিজের আমলের সাওয়াব পাওয়ার বিষয়টি ভুলে যাওয়া। (আর-রিসালাতুল কুশাইরিয়্যা)

হুযাইফা মারআশী রহ. বলেন–

অনুবাদঃ ইখলাস বা অভ্যন্তরীণ পরিশুদ্ধতা হলো বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ আমল এক রকম হওয়া। কেউ কেউ বলেন, যা দ্বারা একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে উদ্দেশ্য করা হয় তাই ইখলাস। এর দ্বারা সত্যও উদ্দেশ্য হয়।

আবার কারো কারো মতে আমল প্রত্যক্ষ করা থেকে চক্ষু বন্ধ রাখা। (আর-রিসালাতুল কুশাইরিয়্যা)
বর্ণিত সবগুলো ঘটনাই অভ্যন্তরীণ পরিশুদ্ধির গুরুত্বের দিকে ইঙ্গিত করে।

এ প্রসঙ্গে আল্লামা ইকবাল বলেন–
অনুবাদঃ সম্প্রদায়ের উপদেশদাতাদের উপদেশে কোনো দৃঢ়তা নেই। প্রাণকে তাড়িত করে এমন কোনো শক্তি নেই, নেই কোনো জ্বালাময়ী ভাষণ। আযানের ধ্বনি অবশিষ্ট আছে কিন্তু বেলালের সেই রূহানিয়াত নেই। দর্শনতো আছে কিন্তু গাযযালীর সে তালকীন অবশিষ্ট নেই। (জওয়াবে শিকওয়াহ)

অভ্যন্তরীণ বিষয়ের পরিশুদ্ধি প্রসঙ্গে ইমাম গাযযালী (র.) এর 'কিমিয়ায়ে সাআদাত' কিতাবে বর্ণিত আরেকটি ঘটনা হচ্ছে-
অনুবাদঃ কতিপয় আলিম বক্তৃতা করে বেড়ান। তাদের বক্তৃতা ছন্দময় এবং সূক্ষ্ম তত্ত্বসমৃদ্ধ অথচ অসার কথায় পূর্ণ। বক্তৃতাকালে তারা এমন সুন্দর সুন্দর শব্দ ব্যবহার করেন যাতে শ্রোতামন্ডলী তাদেরকে বাহবা দেয় এবং বক্তৃতার প্রশংসা করে। শ্রোতার হৃদয়ে পরকালের ভয়ের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে দেওয়া যাতে পরকালের শাস্তি তাদের চোখের উপর প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে এবং তারা পরকালের ভয়ে রোদন করতে থাকে, এটিই যে উপদেশ প্রদানের উদ্দেশ্য তারা তা উপলব্ধি করেন না। (কিমিয়ায়ে সাআদাত)

সূফী কবি মাওলানা জালালুদ্দীন রূমী (র.) বলেন–
অনুবাদঃ ভিক্ষুক রুটির জন্য আল্লাহর নাম নেয়। খোদাভীরু বান্দাহ অন্তরের অন্তস্থল থেকে আল্লাহর নাম নেয়।
তুমি রুটি রোজগার করার জন্য আল্লাহ আল্লাহ করছ। লোভ ছেড়ে সামনে অগ্রসর হও আর আল্লাহকে ডাকতে থাক। (মসনবী শরীফ)

অনুরূপভাবে কারো বাহ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি দেখে তাকে পরিমাপ করা ঠিক নয়। কেননা বাহ্যিকভাবে কেউ খুবই পরিপাটি ও ইবাদত গোজার হতে পারে। কিন্তু তার অন্তর বাহিরের চেয়ে বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
ইমাম বুখারী (র.) একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন- কোনো এক যুদ্ধে নবী করীম (সা.) এর সাথে কাফেরদের মোকাবিলা হয়, তখন 'কাযমান' নামক এক ব্যক্তি সাহাবীদের সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। সে ছিল মূলতঃ মুনাফিক। সে এ যুদ্ধে মুশরিকদের সাথে প্রাণপণ যুদ্ধ করে খুবই যশ ও খ্যাতি প্রদর্শন

করেছিল। তখন হযরত সাহাল ইবনে সা'দ সায়েদী নামক একজন সাহাবী বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আজ আমাদের মধ্যে অমুক ব্যক্তি যেরূপ বীরত্ব প্রদর্শন করেছে অন্য কেউ অনুরূপ বীরত্ব প্রদর্শন করেনি। নবী করীম (সা.) এ কথা শুনে ইরশাদ করেন- أَمَا أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ অর্থাৎ শুনে রাখ! সে তো জাহান্নামী।

পরিশেষে ঐ ব্যক্তি কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করতে করতে মারাত্মকভাবে আহত হয় এবং আহত হওয়ার কষ্ট সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করে।

হাফিয ইবনে হাজর আসকালানী (র.) এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, শিরোনামের সাথে এ হাদীসের এই সামঞ্জস্য রয়েছে যে, ঐ ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার জন্য যুদ্ধ করেনি, বরং জাতীয় ও গোত্রীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ করেছে। তাই এ ধরনের ব্যক্তিকে শহীদ বলা যায় না। (ফতহুল বারী)

অন্য একটি হাদীসে এসেছে- হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) এর যুগে একজন লোক ছিল যার ইবাদত ও মুজাহাদা আমাদেরকে আশ্চর্য করত। আমরা তার নাম ও গুণাবলি উল্লেখ করে রাসূলের কাছে তার পরিচয় তুলে ধরলাম, কিন্তু তিনি তাকে চিনতে পারলেন না। একদিন আমরা তার আলোচনা করছি, এমন সময় লোকটি আমাদের নিকট উপস্থিত হলো। আমরা বললাম, এই সেই ব্যক্তি। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, তোমরা আমার কাছে এমন ব্যক্তির সংবাদ দিচ্ছে যার চেহারায় শয়তানী রং মিশ্রিত। ঐ ব্যক্তি এসে তাঁর পাশে দাঁড়ালো, কিন্তু সালাম দিলো না। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, আল্লাহর কসম! তুমি যখন মজলিসের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলে তখন কি তুমি মনে মনে এই কথা বলনি যে, এই দলের মধ্যে তোমার চেয়ে উত্তম কোনো লোক নেই। সে বলল, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল। এরপর সে নামায পড়তে লাগল।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, এরপর সে মসজিদের এক পাশে চলে গেল ও নামাযের প্রস্তুতি নিল, পা সোজা করল এবং নামায পড়তে শুরু করল। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, কে আছো ঐ লোকটিকে হত্যা করবে? হযরত আবূ বকর (রা.) বললেন, আমি (তাকে হত্যা করব)। এরপর তিনি তার কাছে গেলেন এবং নামাযরত দেখে বলতে লাগলেন, সুবহানাল্লাহ! নামাযরত ব্যক্তিকে কিভাবে আমি হত্যা করব? অথচ রাসূলুল্লাহ (সা.) নামাযী ব্যক্তিকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। হযরত আবূ বকর (রা.) বের হয়ে এলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, তুমি কী করেছ? তিনি জবাব দিলেন, আমি তাকে

নামাযরত অবস্থায় হত্যা করতে অপছন্দ করি। কারণ আপনি নামাযীদেরকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। অতঃপর উমর (রা.) বললেন, আমি তাকে হত্যা করব। তিনি প্রবেশ করলেন এবং তার চেহারা অবনমিত অবস্থায় পেলেন। আর বললেন, সে আমার চেয়ে উত্তম। এই বলে তিনি বের হয়ে এলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, তুমি কী করেছ? তিনি বললেন, আমি তাকে চেহারা অবনমিত অবস্থায় পেলাম, এ কারণে তাকে হত্যা করা অপছন্দ করলাম। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, কে আছো এই লোকটিকে হত্যা করবে? হযরত আলী (রা.) বললেন, আমি। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, তুমিই তাকে হত্যা করবে যদি তাকে পাও। হযরত আলী (রা.) ভিতরে গেলেন এবং দেখলেন লোকটি চলে গেছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কাছে ফিরে এলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাকে বললেন, তুমি কী করেছ? তিনি বললেন, আমি গিয়ে দেখলাম সে চলে গেছে। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা.)বলেন, যদি তাকে হত্যা করা হতো তাহলে আমার উম্মতের দুই ব্যক্তির মধ্যে বিরোধ দেখা দিত না। সেই হতো ফিতনার ক্ষেত্রে প্রথম ও শেষ। বর্ণনাকারী মূসা বলেন, আমি মুহাম্মদ বিন কা'বকে বলতে শুনেছি, ঐ স্তনবিশিষ্ট লোকটিকে হযরত আলী (রা.) হত্যা করেছেন। (মুসনাদে আবি ইয়ালা, আবদুর রাযযাক ও আবু নুআইম)

সারকথা, হাদীসে বর্ণিত ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে কামিল বা মর্যাদাবান ব্যক্তি ছিল না, সে খারিজী ছিল এবং সে নিজেকে কামিল মনে করত, যে কারণে নবী করীম (সা.) তাকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

আবুল কাশেম কুশাইরী (র.) একটি ঘটনা উল্লেখ করেন- আবুল হুসাইন আন নূরী এক লোককে আজান দিতে শুনে বললেন, আল্লাহ তোমাকে বর্শা দিয়ে আঘাত করুন, মারণবিষ দিন। অপর দিকে একটি কুকুরকে ঘেউ ঘেউ করতে শুনে বলেন, আমি তোমার খেদমতে হাজির আছি। তাকে বলা হলো এটাতো সুস্পষ্ট ধর্মদ্রোহিতা। কারণ শাহাদাত উচ্চারণের সময় মুয়াজ্জিনকে তিনি বর্শাঘাত ও মরণবিষের কথা বলেছেন। অথচ কুকুরের ঘেউ ঘেউ করার সময় 'আমি উপস্থিত' বলেছেন। তাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন এই মুয়াজ্জিন সম্পূর্ণ উদাসিন হয়ে আল্লাহকে স্মরণ করছেন আর এই কুকুরের ক্ষেত্রে আল্লাহতো বলেছেন, এমন কিছু নেই যা তার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে না। (আর-রিসালাতুল কুশাইরিয়া)

উক্ত ঘটনা থেকে বুঝা যায়, ব্যক্তি বাহ্যিকভাবে আযান দিচ্ছে কিন্তু সেই আযান খালিছ না হওয়ায় উক্ত বুযুর্গ তাকে লা'নত করেছেন।

একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,মহান আল্লাহকে যখন প্রিয় কোনো বান্দাহ ডাকেন তখন তিনি বলেন, জিবরাইল এখনই আমার বান্দার প্রয়োজন পূরণ কর না। আমি তার কণ্ঠস্বর শুনতে পছন্দ করি। আল্লাহকে যখন তার অপ্রিয় কোনো বান্দাহ ডাকে তখন তিনি বলেন, জিবরাঈল আমার বান্দার প্রয়োজন পূরণ করে দাও। আমি তার কণ্ঠস্বর শুনতে অপছন্দ করি। (ইবনে মাজাহ)

উক্ত হাদীস থেকে বুঝা যায়, মানুষ যখন রিয়ামুক্ত হয়ে কোন কিছু চায় কিংবা মানুষকে উপদেশ দেয়, তখন আল্লাহ তা পছন্দ করেন। সুতরাং বাহ্যিক অবস্থা দেখে সকল কিছু যাচাই করা সঠিক নয়।

শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) 'আনফাসুল আরেফিন' কিতাবে লেখেন, 'আমার ওয়ালিদ মুহতারাম- এর একজন খালেস অনুসারী তাকে প্রশ্ন করেছিলেন, মানুষের জীবন কিভাবে অতিবাহিত করা উচিৎ। জবাবে তিনি বলেছিলেন,

كن فى الناس كاحد من الناس–

অর্থাৎ তুমি মানুষের মধ্যে তাদেরই একজন হয়ে অবস্থান কর।

কোনো ব্যক্তিরই নিজের আমলকে নিয়ে গর্ববোধ করা বা আত্মতৃপ্তি লাভ করা উচিৎ নয়। আউলিয়ায়ে কিরামের মধ্যে উচ্চ পর্যায়ের খোদাভীতি পরিলক্ষিত হয়। আউলিয়ায়ে কিরামের আল্লাহভীতির বহিঃপ্রকাশ নিম্নোক্ত বর্ণনায় পাওয়া যায়- ইবন আবূ মুলাইকা (র.) বলেন,

أَدْرَكْتُ ثَلَاثِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَحَدٌ يَقُولُ إِنَّهُ عَلَى إِيمَانِ جِبْرِيلَ كُلُّهُمْ يَخَافُ النِّفَاقَ عَلَى نَفْسِهِ مَا مِنْهُمْ وَمِيكَائِيلَ وَيُذْكَرُ عَنْ الْحَسَنِ مَا خَافَهُ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَلَا أَمِنَهُ إِلَّا مُنَافِقٌ– (بخاري)

-আমি নবী করীম ﷺ এর এমন ত্রিশজন সাহাবীকে পেয়েছি, যারা সবাই নিজেদের সম্পর্কে নিফাকের ভয় করতেন। তাঁরা কেউ এ কথা বলতেন না যে, তিনি জিবরাঈল (আ.) ও মীকাঈল (আ.) এর তুল্য ঈমানের অধিকারী। হাসান বসরী (র.) থেকে বর্ণিত, নিফাকের ভয় কেবল মুমিনই করে থাকে। আর কেবল মুনাফিকই তা থেকে নিশ্চিন্ত থাকে। (সহীহ বুখারী, হাদীস-৪৭)

এছাড়া মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাতিব হানযালা আল উসায়দী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) আমার সাথে সাক্ষাৎ করলেন এবং

আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কেমন আছো, হে হানযালা? আমি বললাম, হানযালা তো মুনাফিক হয়ে গেছে। তখন তিনি বললেন, সুবহানাল্লাহ তুমি কি বলছো? [হানযালা (রা.)] বলেন, আমি বললাম, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নিকট বসি, অবস্থান করি, তিনি আমাদের জান্নাত-জাহান্নামের কথা স্মরণ করিয়ে দেন যেন চোখ দিয়ে আমরা তা প্রত্যক্ষ করছি। কিন্তু আমরা যখন রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নিকট থেকে বের হয়ে নিজেদের স্ত্রী-সন্তান এবং ধন-সম্পদের মাঝে ডুবে যাই তখন আমরা এর অনেক কিছু ভুলে যাই। আবূ বকর (রা.) বললেন, আল্লাহর শপথ! আমারও তো এই অবস্থা। তারপর আমি এবং আবূ বকর (রা.) রওনা হলাম এবং আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট উপস্থিত হলাম। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! হানযালা মুনাফিক হয়ে গিয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তা কীভাবে? আমি বললাম, আমরা আপনার নিকট থাকি, আপনি আমাদের জান্নাত-জাহান্নামের কথা স্মরণ করিয়ে দেন, যেন আমরা তা প্রত্যক্ষ দেখতে পাই। কিন্তু এরপর আমরা যখন আপনার কাছ থেকে বের হই এবং স্ত্রী-সন্তান সন্ততি ও ধন-সম্পদের মাঝে যাই তখন আমরা এর অনেক কিছু ভুলে যাই। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন,যে সত্তার নিয়ন্ত্রণে আমার প্রাণ আমি তাঁর শপথ করে বলছি! আমার নিকট থাকাকালে তোমাদের যে হাল হয়, যদি তোমরা সর্বদা এ অবস্থায় অবিচল থাকতে এবং সর্বদা আল্লাহর যিকরে মশগুল থাকতে তবে অবশ্যই ফিরিশতাগণ তোমাদের বিছানায় ও রাস্তায় তোমাদের সাথে মুসাফাহা করতো। কিন্তু হে হানযালা! কিছু সময় এই রকম কিছু সময় ঐ রকম। (সহীহ মুসলিম-৬৭১৩)

এ থেকে প্রমাণীত হয় যে, কামিল বুযুর্গের সহবতে থাকলে অন্তর নম্র হয়, আল্লাহর প্রতি অধিক মনোনিবেশ করা যায়। এমনকি মুশাহাদা বা কাশফের মাধ্যমে অনেক অলৌকিক বিষয় চোখের সামনে উদ্ভাসিত হতে পারে।

বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সাহাবায়ে কিরাম নিজেদের ব্যাপারে নিফাকের আশঙ্কা করেছেন। এটি মূলত সাহাবায়ে কিরামের এক ধরনের বিনয় প্রকাশ। এ থেকে এ বিষয়ে ওয়াসওয়াসায় পতিত হওয়ার সুযোগ নেই যে, সাহাবায়ে কিরামও মাঝে মাঝে মুনাফিকিতে নিমজ্জিত হয়েছেন। উলামায়ে কিরামের সর্বসম্মত মত হলো আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সব ধরনের নিফাক থেকে রক্ষা করেছেন এবং সকলেই আদিল বা ন্যায়পরায়ণ।

একইভাবে দেখা যায় হযরত উমর ইবন আবদুল আযীয (র.) একজন বড় আবিদ ছিলেন। বিশেষ করে খিলাফতের আড়াই বছর কালে তাঁর আমল

ছিল- ইশার পর তিনি তাঁর নির্ধারিত হুজরায় চলে যেতেন। মুসাল্লার উপর নফল ইবাদত ও যিকর আযকারে ব্যস্ত হয়ে যেতেন। ঘুম আসলে সেখানেই পড়ে থাকতেন। আবার চোখ খোলে আল্লাহর স্মরণে লেগে যেতেন। সকাল পর্যন্ত এভাবেই থাকতেন। অধিকতর ক্রন্দনের ফলে তাঁর চোখদ্বয় লাল হয়ে যেত।

তাঁর ইন্তিকালের পর ইয়াযীদ বিন আবদুল মালিক তাঁর ঘরে প্রবেশ করল। তার মনে হচ্ছিল ঘরের ভেতর কোনো সম্পদ সংরক্ষিত আছে। কিন্তু দেখা গেল ঘরে একখানা কম্বল ও একখন্ড জিঞ্জির রয়েছে। ইবাদতের সময় তিনি কম্বলখানা পরতেন আর জিঞ্জির গলায় লাগিয়ে রাখতেন। (তারীখুল ইসলাম-২২)

ইবাদত-বন্দেগী এবং রিয়াযত ও মুজাহাদার পর যে সকল আবিদ -যাহিদ এর অন্তরে কোনো ধরনের অহংকার আসে তাদের উমর ইবনে আবদুল আযীয (র.) এর উপরোক্ত ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।

কুতবুল আকতাব আল্লামা শাহ ইয়াকুব বদরপুরী (র.) নিজের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন-

چار چیزیں لے کھڑا جو نادر سرکار ہیں
بیکسي و ناکسی عجز و گناھ بسیار ہیں
رحم کر ہم پر الٰھی اولیاء کے واسطے

-দুর্বলতা, অক্ষমতা ও অশেষ পাপ নিয়ে রব এই অসহায় আপনার সম্মুখে হাযির। সুতরাং হে আমার রব!আউলিয়াগণের ওয়াসীলায় আমাকে রহম করুন। **অন্যত্র বদরপুরী (র.) বলেন-**

قال ابتر حال ابتر سب میرے ابتر ہے کام
فضل اپنے سے تو کر دے ملک دیں کا انتظام
مجھ غریب بینوا بے آسرا کے واسطے

-আমার কথাবার্তা, আমার অবস্থা ও কাজ খুবই মন্দ। সাধ্য ও ক্ষমতাহীন আমার সকল দ্বীনী কাজের ইন্তিজাম তুমি করে দাও।

কবিতাগুলোতে তাঁর বিনয়ের সর্বোচ্চ প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়।

আমার ওয়ালিদ মুহতারাম আল্লামা ছাহেব কিবলাহ ফুলতলী (র.) নিজের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন–

ہائے میرا دل تماشہ گاہ شیطاں بن گیا
تھا خزینہ نور لیکن قصر شیطاں بن گیا
آنکھ سے آنسو بہتی دلمیں غم کی دور ہے
منتظر ہے دید کا دل میں فسانہ بن گیا

-নূরে নূরান্বিত ছিল যে হৃদয় মন, শয়তানের লীলাভূমি হলো তা এখন।
বেদনা-বিধুর মন চোখে বহে নীর দিদারের প্রতীক্ষায় সতত অধীর।

অন্য এক কবিতায় ওয়ালিদ মুহতারাম বলেন–

شرمساری ہے ہماری جرم کے انبار پر
ہنس رہا شیطاں ہماری خونے بد کردار پر
زندگی برباد میری شامت اعمال پر
بد نصیبی چھا گئی ہے جرم کے اصرار پر

-পাপ-বোঝা বয়ে মরি অপমানে লাজে
ভারী খুশি শয়তান দেখে বদ কাজে।
জীবন হইল মাটি গুনায় গুনায়
ডুবিলাম অফুরান দুঃখ হতাশায়।

কোনো কোনো বুযুর্গানে কিরামকে কোনো নির্বোধ ও অহংকারী ব্যক্তি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করলে সেটাকে তারা পছন্দ করতেন।

ইবরাহিম ইবন আদহাম (র.) বলেন, আমার জীবনে আমি কেবল তিনবার আনন্দিত হয়েছি, একবার আমি জাহাজে ছিলাম। সেখানে এক কৌতুকপ্রবণ লোক ছিল। আমরা তুর্কিদের দেশে অবিশ্বাসীদের এভাবে পাকড়াও করি- এটা বলে সে আমার মাথার একটি চুল ধরে ঝাঁকুনি দিল। এটা আমাকে আনন্দিত করল। কারণ তার চোখে জাহাজে আমার চেয়ে নিকৃষ্ট আর কেউ ছিল না।

আরেকবার আমি অসুস্থ হয়ে মসজিদে পড়ে ছিলাম। মুয়াজ্জিন এসে আমাকে বের হয়ে যেতে বলল। কিন্তু আমার বের হয়ে যাওয়ার মতো শক্তি ছিল না। তখন সে আমার পা ধরে টেনে হিঁচড়ে মসজিদের বাইরে ফেলে দিল।

তৃতীয়বার আমি সিরিয়ায় ছিলাম। আমার গায়ে একটি পশমি চামড়া ছিল। আমি তাকিয়ে দেখলাম, কিন্তু তাতে উকুন এত বেশি ছিল যে পশম ও উকুন আলাদা করতে পারলাম না। এতেও আমি আনন্দিত হলাম।

আরেকটি বর্ণনায় তিনি বলেন, একবার আমি বসে ছিলাম। তখন এক লোক এসে আমার গায়ে প্রস্রাব করে দেয়। আমি আর কখনো এত আনন্দিত হইনি। (আর-রিসালাতুল কুশাইরিয়া)

তবে একটি কথা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, কোন বুযুর্গের বিনয়ের সুযোগ গ্রহণ করে তাঁর সাথে বে'আদবী করার কোন অবকাশ নেই। কোন বুযুর্গ ও অলীআল্লাহর সাথে বেআদবী বা শত্রুতা পোষণ আল্লাহর সাথে যুদ্ধ প্রস্তুতি নেয়ার মত জঘন্য অপরাধ।

উল্লেখ্য, যারা কোনো কামিল বুযুর্গের মুরিদ হয়ে নিজের মধ্যে বুযুর্গি ভাব দেখাতে চান, তারা কয়েকটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখলে মা'শুকপ্রীতির অভিশাপ থেকে মুক্ত থাকতে পারবেন।

১. আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্তদের আমলের ফযিলত সম্পর্কে অবগত থাকা। তাদের সাথে নিজেকে তূলনা না করে নিজেকে তুচ্ছ মনে করা।

এ ব্যাপারে মুজাদ্দীদে আলফে সানী (র.) বলেন,আমলের ফযীলতের ক্ষেত্রে যে পার্থক্য হয় তা আমিল বা আমল সম্পাদনকারীর কারণে, আমলের কারণে নয়। একটি আমলের সাওয়াব ও প্রতিদান দুইজন ভিন্ন আমলকারীর কারণে ভিন্ন হয়ে যায়। একই আমল যা আল্লাহর মকবুল ও প্রিয় বান্দাহ'র দ্বারা সংঘঠিত হয় তার সাওয়াব কয়েকগুণ বৃদ্ধি পায় ঐ ব্যক্তির আমলের তুলনায় যে ব্যক্তি আল্লাহর মকবুল ও প্রিয় নন। আমলকারী যদি অধিকতর বুযুর্গ ব্যক্তি হন তবে আমলের সাওয়াবও অধিকতর হবে। এজন্য অনেকেই বলে থাকেন, আরিফ বা আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত ব্যক্তির লোক দেখানো ইবাদতের সাওয়াব মুরিদের ইখলাসের সাথে সম্পাদিত ইবাদতের চেয়েও বেশি। সুতরাং আরিফ যদি ইখলাসের সাথে ইবাদত সম্পন্ন করেন তাহলে তার ফযীলত যে কতগুণ বেশি হবে তা আল্লাহই ভালো জানেন। (মাকতুবাতে ইমামে রাব্বানী, মাকতুব নং- ৫০৩)

২. কেউ প্রশংসা করতে গিয়ে বুযুর্গ ব্যক্তিদের উপর অন্যদের প্রধান্য দিলে এর দ্বারা প্রভাবিত না হওয়া, বরং তার উচিৎ বাধা প্রদান করা।

ইসলামে প্রত্যেক মানুষকে তার প্রাপ্য মর্যাদা প্রদানের প্রতি খুবই জোর দেওয়া হয়েছে। সম্মানিত ব্যক্তিদের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করার গুরুত্ব অপরিসীম। বিভিন্ন হাদীস শরীফ থেকে আমরা এ বিষয়টি জানতে পারি। যেমন- আবূ নুআইম 'হুলইয়া' গ্রন্থে শুরাইহ ইবন উবাইদ থেকে বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি আবূ দারদা (রা.) কে বলল, হে কারী সম্প্রদায়! তোমাদের কী হয়েছে, তোমরা আমাদের চেয়ে বড় কাপুরুষ, তোমাদের কাছে কোনো কিছু চাইলে তোমরা তা প্রদান করতে কৃপণতা করো। যখন তোমরা আহার কর তখন বড় বড় লোকমা গ্রহণ করো। একথা শুনে আবূ দারদা (রা.) তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং তার কথার কোনো উত্তর দিলেন না। অতঃপর হযরত উমর (রা.) এর নিকট এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি আবু দারদা (রা.) কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। আবু দারদা (রা.) বললেন, আল্লাহ আমাদেরকে ক্ষমা করুন! আমরা তাদের কাছ থেকে যা শুনেছি এগুলো আমরা করি। অতঃপর উমর (রা.) আবু দারদা (রা.) কে নিয়ে যে লোকটি উক্ত কথা বলেছিল তার কাছে গেলেন এবং উমর (রা.) তার কাপড় ও গলা চেপে ধরলেন। আর তাকে রাসূলের কাছে নিয়ে আসলেন। তখন লোকটি বলল, আমরাতো হাসি ঠাট্টা ও আনন্দ ফুর্তি করছিলাম। অতঃপর আল্লাহ তাআলা নবীর প্রতি এই আয়াত অবতীর্ণ করেন,

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ- (التوبة)

-তুমি তাদেরকে প্রশ্ন করলে তারা নিশ্চয়ই বলবে আমরাতো আলাপ আলোচনা ও ঠাট্টা মশকরা করছিলাম। (সূরা তাওবাহ, আয়াত- ৬৫) (আবু নুআইম, আল হুলইয়া)

অপর বর্ণনায় আছে, আবূ নুআইম 'ফাদাইলুস সাহাবা' গ্রন্থে বর্ণনা করেন, জুবাইর ইবন নুফাইর থেকে বর্ণিত, একদল লোক হযরত উমর (রা.) কে বলল, হে আমীরুল মুমিনীন! আল্লাহর কসম! আমরা আপনার চেয়ে অধিক ন্যায়বিচারকারী, অধিক সত্য কথা বলার মতো লোক এবং মুনাফিকদের প্রতি অধিকতর কঠোর কোনো লোককে দেখিনি। সুতরাং আল্লাহর রাসূলের পর আপনিই সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি। তখন আউফ ইবন মালিক (রা.)

বললেন, আল্লাহর কসম! তোমরা মিথ্যা বলছো। আমরা নবী করীম (সা.) এর পরে তাঁর (উমর) চেয়ে আরো উত্তম ব্যক্তিকে দেখেছি। হযরত উমর (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, হে আউফ। তিনি কে? তিনি বললেন, তিনি হলেন হযরত আবু বকর (রা.)। হযরত উমর (রা.) বললেন, আউফ সত্য বলেছে। আল্লাহর কসম। তোমরাই মিথ্যা বলেছো। নিশ্চয় আবূ বকর (রা.) মিশকের চেয়েও অধিকতর ঘ্রাণযুক্ত ও পবিত্র। আর আমি আমার পরিবারের উটের চেয়েও পথভ্রষ্ট। ইবন কাসীর বলেছেন, হাদীসটির সনদ সহীহ। (আবূ নুআইম, আল হুলইয়া)

বর্ণিত হাদীসদ্বয়ের প্রথমটিতে হযরত আবূ দারদা (রা.) কে যে ব্যক্তি ভীরু ও কৃপণ বলেছিল তার প্রতি উমর (রা.) ক্রুদ্ধ হন এবং দ্বিতীয় হাদীসে হযরত উমর (রা.) কে হযরত আবূ বকর (রা.) এর চেয়ে অধিক সম্মান প্রদর্শন করার কারণে উমর (রা.) নাখোশ হন এবং স্বয়ং আবূ বকর (রা.) এর ফদীলত বর্ণনা করেন। উভয় ঘটনা ইঙ্গিত করে যে, সম্মানিত ব্যক্তিদের যথাযথ সম্মান না করলে তা বেআদবী হবে এবং এর প্রতিবাদ করাও উচিত। একইভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, ইফকের ঘটনায় যেসকল সাহাবায়ে কিরাম আয়শা (রা.) এর উপর আরোপিত মিথ্যা অপবাদ বিশ্বাস করেননি, বরং তার প্রতিবাদ করেছিলেন তারাই আল্লাহর নিকটে অধিক প্রশংসনীয় হয়েছিলেন। সুতরাং সবার উচিত কোনো বুযুর্গের নামে কোনো অপবাদ শুনলে তা বিশ্বাস না করে প্রতিবাদ করা।

৩. সাধারণ মানুষের প্রশংসায় আত্মতুষ্টিতে না ভোগা এবং নিন্দাকে অপছন্দ না করা, ক্রোধান্বিত না হওয়া কিংবা নিন্দাকারীর নিন্দা থেকে বিরত থাকা। নিন্দাকে পরোয়া না করে সর্বদা বুযুর্গদের অনুসরণে অটল থাকা এবং প্রশংসা পেলে প্রভাবিত না হয়ে যথাসম্ভব বাধা প্রদান করা ও প্রশংসার সুযোগ বন্ধ করা।

৪. নিজেকে ভুলের উর্ধ্বে মনে না করা। কেউ ভুল ধরলে শুধরানোর জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকা এবং এক্ষেত্রে অন্যের ভুলের সাথে তুলনা না দিয়ে নিজেকে সংশোধন করাটাই মূখ্য বিষয় মনে করা।

৫. বুযুর্গ ব্যক্তিদের সম্মানের চোখে দেখা।

মনে রাখা উচিত, বুযুর্গ বা সম্মানিত ব্যক্তিদেরকে নিজের সমকক্ষ মনে না করে এবং তাঁর সমকক্ষ হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন না করে বুযুর্গ ব্যক্তির প্রতি যথাযথ সম্মান করাই ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা। এমনকি ওই বুযুর্গ ব্যক্তি যদি অপর ব্যক্তিকে সম্মান মর্যাদা দিয়েও থাকেন তবুও বুযুর্গ ব্যক্তির প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শনে সচেষ্ট থাকতে হবে।

বুযুর্গের প্রতি যথাযথ আদব-সম্মান না থাকলে তার থেকে রূহানী ফয়েয হাসিল সম্ভব নয়।

আবূ নুআইম 'হুলইয়া' গ্রন্থে আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, হযরত ইবন আব্বাস (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নিকট ছিলাম। তিনি পানির পাত্রের দিকে গেলেন, উযূ করলেন এবং দাঁড়িয়ে পানি পান করলেন। আমি বললাম আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ (সা.) যেভাবে করলেন আমিও অনুরূপ করব। অতঃপর আমি দাঁড়িয়ে গেলাম, উযূ করলাম এবং দাঁড়িয়ে পানি পান করলাম। আর আমি তার পিছনে দাঁড়ালাম। তিনি আমাকে তার বরাবরে (সমান্তরালে) ডানদিকে দাঁড়ানোর জন্য ইঙ্গিত করলেন। কিন্তু আমি (তার সমান্তরালে দাঁড়াতে) অসম্মতি জ্ঞাপন করলাম। রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন নামায শেষ করলেন তখন আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তোমাকে আমার সমান্তরালে দণ্ডায়মান হতে কে নিষেধ করেছে? উত্তরে আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার চোখে আপনি সর্বাধিক সম্মানিত ব্যক্তি এবং আমি আপনার সমান্তরালে দণ্ডায়মান হওয়ার চেয়ে আপনি অধিকতর মর্যাদাবান ব্যক্তি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, হে আল্লাহ! আপনি তাকে প্রজ্ঞা প্রদান করুন। (হুলইয়া, আবু নুআইম)

বর্ণিত হাদীসে হযরত ইবন আব্বাস (রা.) কে রাসূলুল্লাহ (সা.) স্বীয় বরাবরে দণ্ডায়মান হওয়ার নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও তিনি তা পালন করেননি। কেননা তিনি নিজেকে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সাথে সমান্তরাল হয়ে দাঁড়িয়ে নামায পড়ার উপযুক্ত মনে করেননি। এর থেকে বুঝা যায় কোনো ব্যক্তি নিজেকে অধিকতর সম্মানিত ব্যক্তির সমকক্ষ মনে না করাই হলো আদব বা শিষ্টাচার। পাশাপাশি রাসূলুল্লাহ (সা.) ইবন আব্বাস (রা.) এর এ কাজকে পছন্দ করেছেন বিধায় তার জন্য দুআ করেছেন।

একইভাবে আহলে তরীকতের নিকট মুরশিদের প্রতি ভালোবাসার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মূলত সাহাবায়ে কিরাম রাসূল এর এর প্রতি ভালোবাসার যে অনন্য নযীর স্থাপন করেছেন, তার অনুসরণেই সূফীগণ আপন মুরশিদের প্রতি আন্তরিক ভালোবাসাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করেন। রাসূল (সা.) এর প্রতি সাহাবায়ে কিরামের ভালোবাসা নিম্নোক্ত হাদীস শরীফ থেকে আমাদের নিকট স্পষ্টত প্রতীয়মান হয়-

হযরত উরওয়া বিন যুবাইর (রা.) মিসওয়ার ইবন মাখরামাহ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, (এটি একটি দীর্ঘ হাদীস, যাতে হুদাইবিয়ার ঘটনা বর্ণিত

হয়েছে। এতে রয়েছে- তারপর উরওয়া চোখের কোণ দিয়ে সাহাবীদের দিকে তাকাতে লাগলেন। তিনি বলেন, আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ (সা.) কখনো থুথু ফেললে তা সাহাবীদের হাতে পড়তো এবং তা গায়ে মুখে মেখে ফেলতেন। তিনি তাঁদের কোনো আদেশ দিলে তা তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে পালন করতেন। তিনি উযূ করলে তাঁর উযূর পানির জন্য সাহাবীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হতো। তিনি যখন কথা বলতেন, তখন নীরবে তারা তা শুনতেন এবং তাঁর সম্মানার্থে সাহাবীগণ তাঁর দিকে তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকাতেন না। তারপর উরওয়া তার সঙ্গীদের কাছে ফিরে গেলেন এবং বললেন, হে আমার কওম, আল্লাহর কসম! আমি অনেক রাজা বাদশাহর নিকটে প্রতিনিধিত্ব করেছি। কায়সার (রোম) কিসরা (পারস্য) ও নাজ্জাশী (আবিসিনিয়ার) সম্রাটের নিকট দূত হিসেবে গিয়েছি; কিন্তু আমি আল্লাহর কসম করে বলতে পারি যে, কোনো রাজা বাদশাহকেই তার অনুসারীদের এত সম্মান করতে দেখিনি, যেমন মুহাম্মদের অনুসারীরা তাঁকে করে থাকে। আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ (সা.) যদি থুথু ফেলেন, তখন তা কোনো সাহাবীর হাতে পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা তা তাদের গায়ে মুখে মেখে ফেলেন। তিনি কোনো আদেশ দিলে তারা তা সঙ্গে সঙ্গে পালন করেন; তিনি উযূ করলে তাঁর উযূর পানি নিয়ে সাহাবীগণের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়; তিনি কথা বললে, সাহাবীগণ নিশ্চুপ হয়ে শুনেন। এমনকি তাঁর সম্মানার্থে তারা তাঁর চেহারার দিকেও তাকান না। তিনি তোমাদের কাছে একটি ভালো প্রস্তাব পাঠিয়েছেন, তোমরা তা মেনে নাও। (সহীহ বুখারী, হাদীস-২৭৩১)

বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সাথে সাহাবায়ে কিরাম যে আচরণ দেখিয়েছেন তা থেকে এ কথা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, আহলে তরীকতের কাছে এটি গুরুত্বপূর্ণ যে, শায়খের প্রতি মুরীদগণ জীবন উৎসর্গ করে ভালোবাসা প্রদর্শন করেন। যা পার্থিব রাজা-বাদশাহদের ভালোবাসার চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

বুখারী শরীফের حلاوة الإيمان অধ্যায়ে একখানা হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহর রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন, ঈমানের স্বাদ গ্রহণের তিনটি উপায়। তন্মোধ্য একটি হচ্ছে أَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لا يُحِبُّهُ إلا لله অর্থাৎ কোনো মানুষকে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ভালোবাসা।

মুরশিদের প্রতি মুরীদের ভালোবাসা কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে। তিরমিযী শরীফের এক বর্ণনায় আছে- রাসূল ইরশাদ করেছেন, দাউদ

(আ.) এর একটি দুআ ছিল اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَالْعَمَلَ الَّذِي يُبَلِّغُنِي حُبَّكَ অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি আপনার ভালোবাসা কামনা করছি এবং আপনাকে যে ভালোবাসে তাঁর ভালোবাসা কামনা করছি। আমি এমন আমলের কামনা করছি যা আপনার ভালোবাসা পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়। (সুনান আত-তিরমিযী, হাদীস-৩৪৯০)

একটি বিষয় লক্ষণীয়, কারো প্রতি মহব্বত তৈরীর জন্য তার প্রতি যথাযথ সম্মান এবং তাকে ভালোভাবে চিনা-জানা উচিত। ওহাবীরা রাসূলে পাক (সা.) এর সাথে অবাস্তব বেয়াদবীমূলক ধারণা রাখে এজন্য যে রাসূলে পাক (সা.) এর প্রতি মহব্বত তাদের শুন্যের কোটায়। রাসূলে পাক (সা.) সম্পর্কে ওহাবীদের ধারণা তুলে ধরতে গিয়ে মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী সাহেব বলেন, হুজুর পুর নূর (সা.) এর মর্যাদা এবং শানে নবুয়ত ও শানে রেসালত সম্পর্কেও বড় মতবিরোধ রয়েছে। এই ব্যাপারে ওয়াহাবী সম্প্রদায় নিম্নোক্ত জঘন্য ও নাপাক আকিদা পোষণ করে।

(ক) ওয়াহাবীরা হযরত রাসূলে মকবুল (সা.) এর ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদায় মারাত্মক অশোভন ও বেআদবি মূলক শব্দ ব্যবহার করে। এরা নিজেদেরকে হুজুর পাক (সা.) এর সমতুল্য ধারণা করে। হুজুর পাক (সা.) এর ফযীলত কেবল এতটুকু স্বীকার করে, পৃথিবীতে জীবিতাবস্থায় ইসলাম প্রচার প্রসারে নিরত থাকতে যা হাসিল হয়েছিল।

(খ) নাপাক আকিদায় বিদ্বেষী হয়ে এ কথাও বলে ফেলে 'আমরাই মানুষকে হেদায়েত করে রাস্তায় আনছি'।

(গ) তাদের ধারণা রাসুলে মকবুল (সা.) এর কোনো হক ও অধিকার এখন (ওফাতে যাহেরা বা তিরোধানের পর) আমাদের উপর আর নেই। তেমনি ওফাতের পর তাঁর কোনো ইহসানও আমাদের উপর বাকী নেই। এমনকি হুজুর (সা.) এর মাধ্যমে বর্তমানে আমাদের কোনো উপকারও হয় না। নাউযুবিল্লাহ।

(ঘ) পূর্বোক্ত আকিদার উপর ভিত্তি করে এরা বড় ফেতনা ছড়াচ্ছে। তারা বলে, দুআর মধ্যে (সা.) এর ওসিলা নেয়া বা ওসিলা নিয়ে দুআ করা নাজায়েয।

(ঙ) نقل کفر کفر نه باشد অর্থাৎ কারো কুফরি বর্ণনা করা কুফরি নয়। এদের মধ্যে যারা শীর্ষস্থানীয় তারা বলে (মাআযাল্লাহ)! আমাদের হাতের লাঠিও রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সত্তা হতে বেশি উপকারী। কারণ আমরা তো লাঠির

দ্বারা কুকুরকে দমাতে পারি। কিন্তু ওফাতের পর রাসূলুল্লাহ (সা.) এর হাত দ্বারা তো এও সম্ভব নয়।
হে খোদা দয়াময়। এমন নাপাক ও কুফরী আকিদা থেকে আমাদিগকে এবং সকল উম্মতে মুহাম্মদী (সা.) কে বাঁচিয়ে রাখুন। (অনুবাদক) (আশ শিহাবুস সাকিব-১০১)

দুনিয়া লাভের উদ্দেশ্যে কিংবা অহংকারবশতঃ কোনো বুযুর্গের কাছে গেলে তার থেকে রূহানী ফয়েয লাভ করা সম্ভব নয়

শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী (র.) যৌবনকালে একজন বুযুর্গের সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে গমন করছিলেন। সাথে আরো দুই ব্যক্তি ছিল। তাদের পরস্পরে কথাবার্তা হচ্ছিল, যেমনটি রাস্তা অতিক্রমকারী বন্ধুদের মধ্যে হয়ে থাকে। একজন বললেন, হে ভাই! তুমি ঐ বুযুর্গের নিকট কি উদ্দেশ্যে যাচ্ছো? এক ব্যক্তি কিছু পার্থিব স্বার্থের কথা উল্লেখ করল এবং বলল, আমি রিযিক বর্ধিত হওয়া ও অন্যান্য উদ্দেশ্যে দোয়া করানোর জন্য যাচ্ছি। দ্বিতীয় জন যে আলিম ছিল, তার নাম ছিল ইবনুস সাকা। সে বলল, আমিতো সে বুযুর্গকে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছি, যাতে জানতে পারি তিনি কেবলই বুযুর্গ, নাকি ইলমের সাথেও তাঁর কোনো সম্পর্ক রয়েছে। তাকে এমন দুর্বোধ্য প্রশ্ন করব যাতে এর কোনো উত্তর দিতে না পারেন। অতঃপর আব্দুল কাদির জিলানীকে ঐ দু'জন জিজ্ঞেস করল, হে ছাহেবজাদা তুমি কোন উদ্দেশ্যে তার নিকট গমন করছ? তিনি উত্তর দিলেন, আমি কেবলমাত্র এ উদ্দেশ্যে গমন করছি যে, এই বুযুর্গ আল্লাহর একজন মকবুল বান্দাহ, হয়তো তাঁর সাথে সাক্ষাত করার মাধ্যমে আমার অন্তরের সংশোধন অর্জিত হবে আর আল্লাহ তায়ালা আমার অবস্থার উপরও অনুগ্রহ করবেন।

অবশেষে তিনজনই উক্ত বুযুর্গের নিকট পৌঁছলেন। তিনি আগে থেকেই তিন জনের অবস্থা কাশফের মাধ্যমে অবগত হলেন। এখন পর্যন্ত তিন জনের কেউই বুযুর্গের নিকট কোনো কিছুই ব্যক্ত করেননি। বুযুর্গ নিজেই সকলের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিলেন। যে ব্যক্তি পার্থিব উদ্দেশ্যে আগমন করেছিল, তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আমি তোমার পায়ের নিচে স্বর্ণ-রৌপ্যের স্তুপ দেখতে পাচ্ছি (অর্থাৎ তার মকসুদ পূর্ণ হয়েছে)।

ইবনুস সাকাকে বললেন, তোমার একটি প্রশ্ন এরূপ, আর এর জবাব হচ্ছে এরূপ। আর তোমার দ্বিতীয় প্রশ্নটি এরূপ, আর জবাব এরূপ। কিন্তু আমি

তোমার চেহারায় কুফুরীর চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি। আমি তোমার সে সময়কার অবস্থাও দেখতে পাচ্ছি যখন তুমি মুরতাদ হয়ে যাবে।

যাই হোক, সে ব্যক্তি একবার সে সময়কার খলিফার পক্ষ থেকে কোনো একটি সংবাদ নিয়ে হিরাক্লিয়াসের দরবারে গমন করেছিল। সে অনেক বড় আলেম ছিল যার কারণে খলিফা তাকে পয়গাম নিয়ে যাওয়ার জন্য নির্বাচিত করেছিলেন। কিন্তু তার ঐ বুযুর্গের সাথে বেআদবী করার পরিণতিতেই সে হিরাক্লিয়াসের নিকট গমন করে তার কোনো এক মেয়ের প্রতি প্রণয়াসক্ত হয়ে তাকে পাবার উদ্দেশ্যে খ্রিস্টান হয়ে যায়। আর এ অবস্থাতেই সে মারা যায়। নাউযুবিল্লাহ।

হযরত আব্দুল কাদির জিলানীর উদ্দেশ্যে ঐ বুযর্গ বললেন, আমার মনে এ কথা উদয় হচ্ছে যে, তুমি বাগদাদের মিম্বরে বসে বলবে, قدمي هذا على رقاب كل أولياء الله আমার পা আল্লাহর সকল অলীদের গর্দানের উপর। আর আমি আরো দেখতে পাচ্ছি আউলিয়ায়ে কেরামের গর্দান সে সময় অবনত রয়েছে।

কত স্পষ্ট কাশফের অধিকারী ছিলেন সেই বুযুর্গ! কেননা তিনি একথা তখন বলেন যখন আব্দুল কাদির জিলানী (র.) বালক ও তরুণ ছিলেন। এ ব্যাপারে কারো ধারণাই ছিল না যে, তিনি কোনো এক সময়ে এমন স্তরে পৌঁছে যাবেন। কিন্তু তার কাশফ একেবারে সঠিক ছিল। বস্তুত পরবর্তীতে তাই ঘটেছিল। হযরত শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী (র.) একবার বাগদাদের মিম্বরে বসে বক্তৃতা করছিলেন। বক্তৃতার মাঝখানে তিনি উত্তেজিত হয়ে পড়লেন এবং বললেন, قدمي هذا على رقاب كل أولياء الله আমার পা আল্লাহর সকল অলিদের গর্দানের উপর। সে সময় যত আউলিয়া কেরাম পৃথিবীতে ছিলেন সবাই সে আওয়াজ শুনতে পেয়েছিলেন এবং তাদের স্কন্ধ অবনত করেছিলেন। এমনকি কেউ কেউ গর্দান অবনত করে একথাও বলেছিলেন যে بل علي رأسي وعيني (বরং আপনার পদযুগল আমার মস্তক ও নয়নের উপরেও স্থাপিত)। (পছন্দিদা ওয়াকিয়াত: শায়খ আশরাফ আলী থানবী)

মকবুল ওলীদের যশ-খ্যাতি ও উচ্চ মর্যাদার কারণে দুনিয়াদার অনেক আলেম তাদের সাথে বিদ্বেষ পোষণ করে থাকেন। অথচ তা যে কত ক্ষতিকর, তা নিম্ন বর্ণিত হাদীস দ্বারা বুঝা যায়।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন কা'ব তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, বকরীর পালে ছেড়ে দেওয়া ক্ষুধার্ত দু'টি বাঘের চেয়ে

ক্ষতিকর হচ্ছে সম্পদের প্রতি লালসা এবং মুসলমানের দ্বীনদারীতে বিদ্বেষ পোষণ করা। আর বিদ্বেষ সৎকর্মকে এমনভাবে খেয়ে ফেলে যেমনিভাবে আগুন কাঠকে খেয়ে ফেলে। অপর এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, তোমরা বিদ্বেষ পোষণ করা থেকে বিরত থাক; কেননা তা সকল নেক-কাজকে খেয়ে ফেলে যেমনিভাবে আগুন কাঠকে খেয়ে ফেলে। (রাযীন)

সর্বক্ষেত্রে যঈফ হাদীসকে অগ্রহণযোগ্য মনে করা হাদীস শাস্ত্রে অপরিপক্কতার নামান্তর

ফুকাহ ও মুহাদ্দিসীনে কেরামের ফযীলত বর্ণনার ক্ষেত্রে এবং উৎসাহ ও ভীতি প্রদর্শনের জন্য যঈফ হাদীসের উপর আমল করা জায়িয বরং মুস্তাহাব। এ প্রসঙ্গে ইমাম নববী (র.) আল-আযকার কিতাবের ভূমিকায় লেখেন-

قال العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم : يجوز ويُستحب العمل في الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف ما لم يكن موضوعاً ، وأما الأحكام كالحلال والحرام والبيع والنكاح والطلاق وغير ذلك فلا يُعمل فيها إلا بالحديث الصحيح أو الحسن إلا أن يكون في احتياط في شيء من ذلك، كما إذا ورد حديث ضعيف بكراهة بعض البيوع أو الأنكحة، فإن المستحب أن يتنزه عنه ولكن لا يجب

সীহাহ সিত্তাহর অন্যতম কিতাব তিরমিযী শরীফের সংকলক ইমাম তিরমিযী (র.) স্বীয় কিতাবে কোন কোন হাদীস বর্ণনা করে তা যঈফ বলেছেন। সাথে সাথে এও বলেছেন যে, **وقد عمل قوم من أهل العلم بهذا الحديث** (মুহাদ্দিসীনে কেরামের একদল এ হাদীসের উপর আমল করেছেন।) আবার কোনো কোনো হাদীসকে যঈফ বলার পর বলেছেন **والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم** (সকল মুহাদ্দিসীনে কেরামের আমল এ হাদীসের উপর)।

এ প্রসঙ্গে সায়্যিদ মুহাম্মদ বিন আলবী মালিকী মক্কী (র.) স্বীয় **تحقيق الامال** কিতাবে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। নিম্নে তার কিছু অংশ উল্লেখ করা হলো।

والحديث الضعيف– إذا جرى عليه العمل – تقوى وانتهض وصار له مزية على غيره ويستأنس به أهل الاعتبار والنظر ، ويفرحون للعمل به ويعتبرون ذلك داخلا في دائرة

السنة النبوية ولا يبادرون إلى الإنكار أو الحكم بالبدعة والضلالة والمخالفةو شواهد هذا كثيرة في كتب السنة المشرفة . وممن يعتنى به الإمام الحافظ الترمذى ، فإنه في كتابه السنن كثيرا ما ينقل أحاديث ويحكم عليها بالضعف ثم يقول بعد ذلك :(وقد عمل قوم من أهل العلم بهذا الحديث) كما قال في حديث أبي سعيد في دعاء الاستفتاح (أبواب الصلاة / باب ما يقول عند افتتاح الصلاة) ج 1 ص ٢٧٦ وكما قال في حديث علي في ميراث الإخوة من الأم وهو ضعيف (والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم) كتاب الفرائض / باب ماجاء في ميراث الإخوة ج ص ٣٠ وكما قال في حديث تميم الداري في ميراث المشرك الذي يسلم على يد رجل من المسلمين – إنه أولى . فالحديث فيه ضعف ولكن العمل عليه عند بعض أهل العلم) ج ٤ ص ٣٨ وكما قال في حديث أنس بن مالك في الصلاة على الدابة في ماء وطين وهو ضعيف والعمل على هذا عند أهل العلم) أبواب الصلاة / باب ماجاء في الصلاة على الدابة في الطين والمطر ج 1ص ٤٢١ . وكما قال في حديث أبي هريرة في قضاء صلاةركعتي الفجر بعد طلوع الشمس. وهو ضعيف : والعمل على هذا عند بعض أهل العلم) أبواب الصلاة / باب ماجاء في إعادتها بعد طلوع الشمس ج ١ ص ٤٣٣. والحاصل أن هذا الحديث صالح للعمل به ومقبولفي هذا الباب–

এখানে উল্লেখ্য যে, ইমাম তিরমিযী (রাহ.) কোন কোন হাদীসকে যঈফ বলার পরও উক্ত হাদীসের উপর হাদীসের সকল ইমামগণের আমল করার কথা বলেছেন। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, কোন কোন যঈফ হাদীসের উপর হাদীসের ইমামগণের আমল ছিল।

তাহলে কি ইমাম তিরমিযী (র.) এর সমসাময়িক কিংবা তাঁর পূর্বের হাদীসের সকল ইমাম হাদীসের মর্ম উপলব্ধিতে অপরিপক্ক ছিলেন? (নাউযুবিল্লাহ!)